কম্পু

১২ই মার্চ, ওসাকা

আজ সারা পৃথিবী থেকে আসা তিনশোর উপর বৈজ্ঞানিক ও শ'খানেক সাংবাদিকের সামনে কম্পুর ডিমনস্ট্রেশন হয়ে গেল। ওসাকার নামুরা টেকনলজিক্যাল ইনস্টিটিউটের হলঘরের একপ্রান্তে মঞ্চের উপর একটা তিন ফুট উঁচু পেলুসিডাইটের তৈরি স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো স্তম্ভ বা স্ট্যান্ডের উপর কম্পুকে বসানো হয়েছিল। দর্শক বসেছিল মখমলে মোড়া প্রায় সোফার মতো আরামদায়ক সিটে। এখানকার দুজন জাপানি কর্মচারী যখন কম্পুকে নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করল, তখন এই প্ল্যাটিনামে আচ্ছাদিত আশ্চর্য সুন্দর মসৃণ গোলকটিকে দেখে দর্শকদের মধ্যে একটা বিস্ময়মিশ্রিত তারিফের কোরাসে ঘরটা গমগম করে উঠেছিল। যে কম্পিউটার-যন্ত্র পঞ্চাশ কোটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, তার আয়তন হবে একটা ফুটবলের দেড়া, তার ওজন হবে মাত্র বেয়াল্লিশ কিলো, আর তাকে দেখে যন্ত্র বলে মনেই হবে না, এটা কেউ ভাবতে পারেনি। আসলে এই ট্রানজিসটার আর মাইক্রো-মিনিয়েচারাইজেশন বা অতিক্ষুদ্রকরণের যুগে খুব জটিল যন্ত্রও আর সাইজে বড় হবার দরকার নেই। পঞ্চাশ বছর আগে বেঢপ বাক্স-রেডিওর যুগে কি আর কেউ ভাবতে পেরেছিল যে ভবিষ্যতে একটা রিস্টওয়াচের ভিতরে একটা রেডিওর সমস্ত যন্ত্রপাতি পুরে দেওয়া যাবে ?

কম্পু যে মানুষের এক আশ্চর্য সৃষ্টি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এও সত্যি যে, জটিল যন্ত্র তৈরির ব্যাপারে এখনও প্রকৃতির ধারেকাছেও পৌঁছাতে পারেনি মানুষ। আমাদের তৈরি যান্ত্রিক মস্তিষ্কের ভিতর পোরা আছে দশ কোটি সার্কিট, যার সাহায্যে যন্ত্র কাজ করে। মানুষের মস্তিষ্কের আয়তন হল কম্পুর পাঁচ ভাগের এক ভাগ। এই মস্তিষ্ক যার সাহায্যে অবিরাম তার অসংখ্য কাজগুলো করে যাচ্ছে তার নাম নিউরন। এই নিউরনের সংখ্যা হল দশ হাজার কোটি। এ থেকে বোঝা যাবে মস্তিষ্কের কারিগরিটা কী ভয়ানক রকম জটিল।

এখানে বলে রাখি, আমাদের কম্পিউটার অঙ্ক কষে না। এর কাজ হল যে সব প্রশ্নের উত্তর জানতে মানুষ বিশ্বকোষ বা এনসাইক্লোপিডিয়ার শরণাপন্ন হয়, সেই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। আরও একটা বিশেষত্ব এই যে, এই উত্তর অন্য কম্পিউটারের মতো লিখিত উত্তর নয় ; কম্পু উত্তর দেয় কথা বলে। মানুষের গলা আর বিলিতি রুপোর বাঁশির মাঝামাঝি একটা তীক্ষ্ণ স্পষ্ট স্বরে কম্পু প্রশ্নের জবাব দেয়। প্রশ্ন করার আগে 'ওয়ান থ্রি ওয়ান থ্রি ওয়ান থ্রি সেভ্‌ন'—এই সংখ্যাটি বলে নিতে হয়, তার ফলে কম্পুর ভিতরের যন্ত্র চালু হয়ে যায়। তারপর প্রশ্নটা করলেই তৎক্ষণাৎ উত্তর পাওয়া যায়। গোলকের একটা অংশে এক বর্গ ইঞ্চি জায়গা জুড়ে দুশোটা অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। এই ছিদ্র দিয়েই প্রশ্ন ঢোকে, এবং এই ছিদ্র দিয়েই উত্তর বেরোয়। অবিশ্যি প্রশ্নগুলো এমনই হওয়া দরকার যার উত্তর মোটামুটি সংক্ষেপে হয়। যেমন, আজকের ডিমনস্ট্রেশনে এই কথাটা অভ্যাগতদের বলে দেওয়া সত্ত্বেও ফিলিপিনবাসী এক সাংবাদিক কম্পুকে অনুরোধ করে বসলেন—'প্রাচীন চিন সভ্যতা সম্পর্কে কিছু বলো।' স্বভাবতই কম্পু কোনও উত্তর দিল না। কিন্তু সেই একই সাংবাদিক যখন

তাকে তাং, মিং, হান, সুং ইত্যাদি সভ্যতার বিশেষ বিশেষ দিক সম্বন্ধে আলাদা আলাদা করে প্রশ্ন করলেন, তখন কম্পু মুহূর্তের মধ্যে ঠিক ঠিক জবাব দিয়ে সকলকে অবাক করে দিল।

শুধু তথ্য পরিবেশন নয়, কম্পুর বিবেচনার ক্ষমতাও আছে। নাইজেরিয়ার প্রাণিতত্ত্ববিদ ডঃ সলোমন প্রশ্ন করলেন—'একটি বেবুনশাবককে কার সামনে ফেলে রাখা বেশি নিরাপদ—একটি ক্ষুধার্ত হরিণ, না একটি ক্ষুধার্ত শিম্পাঞ্জি?' কম্পু বিদ্যুদ্বেগে উত্তর দিল—'ক্ষুধার্ত হরিণ।' 'হোয়াই?' প্রশ্ন করলেন ডঃ সলোমন। রিনরিনে গলায় উত্তর এল—'শিম্পাঞ্জি মাংসাশী।' এ তথ্যটা অবিশ্যি অতি সম্প্রতি জানা গেছে। দশ বছর আগেও মানুষ জানত বানর শ্রেণীর সব জানোয়ারই নিরামিষাশী।

এ ছাড়া কম্পু ব্রিজ ও দাবা খেলায় যোগ দিতে পারে, গান শুনে সুর বেসুর তাল বেতাল বিচার করতে পারে, রাগরাগিণী বলে দিতে পারে, কোনও বিখ্যাত পেন্টিংয়ের কেবল চাক্ষুষ বর্ণনা শুনে চিত্রকরের নাম বলে দিতে পারে, কোনও বিশেষ ব্যারামে কী ওষুধ কী পথ্য চলতে পারে সেটা বলে দিতে পারে, এমনকী রুগির অবস্থার বর্ণনা শুনে আরোগ্যের সম্ভাবনা শতকরা কত ভাগ সেটাও বলে দিতে পারে।

কম্পুর যেটা ক্ষমতার বাইরে সেটা হল—চিন্তাশক্তি, অনুভবশক্তি আর অলৌকিক শক্তি। তাকে যখন আজ সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ম্যাক্সওয়েল জিজ্ঞেস করলেন আজ থেকে একশো বছর পরে মানুষ বই পড়বে কি না, তখনও কম্পু নিরুত্তর, কারণ ভবিষ্যদ্বাণী তার ক্ষমতার বাইরে। এই অভাব সত্ত্বেও একটা কারণে কম্পু মানুষকে টেক্কা দেয়, সেটা হল এই যে, তার মস্তিষ্কে যে তথ্য ঠাসা রয়েছে তার ক্ষয় নেই। বয়স হলে অতি বিজ্ঞ মানুষেরও মাঝে মাঝে স্মৃতিভ্রম হয়। যেমন আমি এই কিছুদিন আগে গিরিডিতে আমার চাকরকে প্রহ্লাদ বলে না ডেকে প্রয়াগ বলে ডাকলাম। এ ভুল কম্পু কখনও করবে না, করতে পারে না। তাই মানুষের তৈরি হয়েও সে একদিক দিয়ে মানুষের চেয়ে বেশি কর্মক্ষম।

এখানে বলে রাখি যে কম্পু নামটা আমারই দেওয়া, আর সকলেই নামটা পছন্দ করেছে। যন্ত্রের পরিকল্পনার জন্য দায়ী জাপানের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মাৎসুয়ে—যাঁকে ইলেকট্রনিক্‌সের একজন দিকপাল বলা চলে। এই পরিকল্পনা জাপান সরকার অনুমোদন করে, এবং সরকারই এই যন্ত্র নির্মাণের খরচ বহন করে। নামুরা ইনস্টিটিউটের জাপানি কর্মীরা যন্ত্রটা তৈরি করেন প্রায় সাত বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে। চতুর্থ বছরে প্রাথমিক কাজ শেষ হবার কিছু আগে মাৎসুয়ে পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশের সাতজন পণ্ডিত ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানান এই যান্ত্রিক মগজে তথ্য ঠাসার ব্যাপারে সাহায্য করতে। বলা বাহুল্য, আমি ছিলাম এই সাতজনের একজন। বাকি ছ'জন হলেন—ইংলন্ডের ডঃ জন কেন্‌সলি, যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজির ডঃ স্টিফেন মেরিভেল, সোভিয়েত রাশিয়ার ডঃ স্টাসফ, অস্ট্রেলিয়ার প্রোফেসর স্ট্র্যাটন, পশ্চিম আফ্রিকার ডঃ উগাটি ও হাঙ্গেরির প্রোফেসর কুট্‌না। এর মধ্যে মেরিভেল জাপানে রওনা হবার তিনদিন আগে হৃদরোগে মারা যান; তাঁর জায়গায় আসেন ওই একই ইনস্টিটিউটের প্রোফেসর মার্কাস উইঙ্গফিল্ড। এঁদের কেউ কেউ টানা তিন বছর থেকেছেন ওসাকায় জাপানসরকারের অতিথি হয়ে; আবার কেউ কেউ, যেমন আমি, কিছুকাল এখানে কাটিয়ে দেশে ফিরে গিয়ে কিছু কাজ সেরে আবার এখানে চলে এসেছে। আমি এইভাবে যাতায়াত করেছি গত তিন বছরে এগারোবার।

এখানে একটা আশ্চর্য ঘটনার কথা বলি। গত পরশু অর্থাৎ ১০ই মার্চ ছিল সূর্যগ্রহণ। এবার যেসব জায়গা থেকে পূর্ণগ্রাস দেখা গেছে, তারমধ্যে জাপানও পড়েছিল। এটা একটা বিশেষ দিন বলে আমরা গত বছর থেকেই ঠিক করে রেখেছিলাম যে, যেভাবে হোক গ্রহণের আগেই আমাদের কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। ৮ই মার্চ কাজ শেষ হয়েছে মনে করে

যন্ত্রটাকে পরীক্ষা করে দেখা গেল কথা বেরোচ্ছে না। গোলকটা দুটো সমান ভাগে ভাগ হয়ে খুলে যায়। সার্কিটে গণ্ডগোল আছে মনে করে সেটাকে খুলে ফেলা হল। দশ কোটি কম্পোনেন্টের মধ্যে কোথায় কোনটাতে গণ্ডগোল হয়েছে খুঁজে বার করা এক দুরূহ ব্যাপার।

দু'দিন দু'রাত অনুসন্ধানের পর ১০ই ঠিক যে মুহূর্তে গ্রহণ লাগবে—অর্থাৎ দুপুর একটা সাঁইত্রিশে—ঠিক সেই মুহূর্তে কম্পুর স্পিকারের ভিতর দিয়ে একটা তীক্ষ্ণ শিসের মতো শব্দ বেরোল। এটাই কম্পুর আরোগ্যের সিগন্যাল জেনে আমরা হাঁফ ছেড়ে গ্রহণ দেখতে চলে গেলাম। অর্থাৎ গ্রহণ লাগার মুহূর্ত আর কম্পুর সক্রিয় হবার মুহূর্ত এক। এর কোনও গূঢ় মানে আছে কি ? জানি না।

কম্পু ইনস্টিটিউটেই রয়েছে। তার জন্য একটা শীততাপনিয়ন্ত্রিত আলাদা কামরা তৈরি হয়েছে। ভারী সুদৃশ্য ছিমছাম এই কামরা। ঘরের একপাশে দেয়ালের ঠিক মাঝখানে তার স্ফটিকের বেদির ওপর যন্ত্রটা বসানো থাকবে। বেদির ওপরে একটা বৃত্তাকার গর্ত ঠিক এমন মাপে তৈরি হয়েছে যে, কম্পু সেখানে দিব্যি আরামে বসে থাকতে পারে। কামরার উপরে সিলিংয়ে একটি লুকোনো আলো রয়েছে, সেটা এমনভাবে রাখা যাতে আলোকরশ্মি সটান গিয়ে পড়ে কম্পুর ওপর। এই আলো সর্বক্ষণ জ্বলবে। কামরায় পাহারার বন্দোবস্ত আছে, কারণ কম্পু একটি মহামূল্য জাতীয় সম্পত্তি। এইসব ব্যাপারে আন্তর্জাতিক ঈর্ষার কথাটা ভুললে চলবে না। উইঙ্গফিল্ডকে এর মধ্যেই দু-একবার গজগজ করতে শুনেছি ; তার আক্ষেপ, এমন একটা জিনিস আগেভাগে জাপান তৈরি করে ফেলল, যুক্তরাষ্ট্র পারল না। এখানে উইঙ্গফিল্ড সম্বন্ধে একটা কথা বলে নিই : লোকটি যে গুণী তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাকে কারুরই বিশেষ পছন্দ নয়। তার একটা কারণ ভবিশ্যি এই যে, উইঙ্গফিল্ড হাসতে জানে না। অন্তত গত তিন বছরে ওসাকাতে তাকে কেউ হাসতে দেখেনি।

বাইরে থেকে আসা সাতজন মনীষীর মধ্যে তিনজন আজ দেশে ফিরে যাচ্ছে। যারা আরও কয়েকদিন থেকে যাচ্ছে তারা হল উইঙ্গফিল্ড, কেন্‌সলি, কুট্‌না আর আমি। উইঙ্গফিল্ড বাতের রুগি, সে ওসাকার একজন বিশেষজ্ঞকে দিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছে। আমার ইচ্ছা জাপানটা একটু ঘুরে দেখব ; কাল কিয়োটো যাচ্ছি কেন্‌সলির সঙ্গে। কেন্‌সলি পদার্থবিজ্ঞানী হলেও তার নানান ব্যাপারে উৎসাহ। বিশেষ করে জাপানি আর্ট সম্বন্ধে তো তাকে একজন বিশেষজ্ঞই বলা চলে। সে কিয়োটো যাবার জন্য ছটফট করছে ; ওখানকার বৌদ্ধমন্দির আর বাগান না দেখা অবধি তার সোয়াস্তি নেই।

হাঙ্গেরির জীববিজ্ঞানী ক্রিস্টফ কুট্‌নার আর্টে বিশেষ উৎসাহ নেই, তবে তার মধ্যে একটা দিক আছে যেটা সম্বন্ধে অন্যে না জানলেও আমি জানি, কারণ আমার সঙ্গেই কুট্‌না এ বিষয়ে কথা বলে। বিষয়টাকে ঠিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত বলা চলে না। উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। আজ সকালে ব্রেকফাস্টের সময় আমরা একই টেবিলে বসেছিলাম ; আমার মতো কুট্‌নারও ভোরে ওঠা অভ্যাস। কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে সে হঠাৎ বলল, 'আমি সেদিন সূর্যগ্রহণ দেখিনি।'

এটা অবিশ্যি আমি খেয়াল করিনি। আমি নিজে ঘটনাটাকে এত বেশি গুরুত্ব দিই, পূর্ণগ্রাসের পর সূর্যের করোনা বা জ্যোতির্বলয় দেখে এতই মুগ্ধ হই যে, আমার পাশে কে আছে না আছে সে খেয়াল থাকে না। কুট্‌না কী করে এমন একটা ঘটনা দেখার লোভ সামলাতে পারল জানি না। বললাম, 'তোমার কি সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে কোনও সংস্কার আছে ?'

কুট্‌না আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে একটা পালটা প্রশ্ন করে বসল।

'সূর্যগ্রহণ কি প্ল্যাটিনামের উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করে ?'

'করে বলে তো জানি না,' আমি বললাম। 'কেন বলো তো ?'

'তা হলে আমাদের যন্ত্রটা পূর্ণগ্রহণের ওই সাড়ে চার মিনিট এত নিষ্প্রভ হয়ে রইল কেন ? আমি স্পষ্ট দেখলাম পূর্ণগ্রহণ শুরু হতেই গোলকটার উপর যেন একটা কালসিটে পড়ে গেল। সেটা ছাড়ল গ্রহণ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে।'

'তোমার নিজের কী মনে হয় ?' অগত্যা জিজ্ঞেস করলাম আমি। মনে মনে ভাবছিলাম কুট্‌নার বয়স কত, আর তার ভীমরতি ধরল কি না।

'আমার কিছুই মনে হয় না,' বলল কুট্‌না, 'কারণ অভিজ্ঞতাটা আমার কাছে একেবারেই নতুন। শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, ব্যাপারটা যদি আমার দেখার ভুল হয় তা হলে আমি খুশিই হব। সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে আমার কোনও সংস্কার নেই, কিন্তু যান্ত্রিক মস্তিষ্ক সম্বন্ধে আছে। মাৎসুয়ে যখন আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি লেখে তখন আমি এ সংস্কারের কথা তাকে জানিয়েছিলাম। বলেছিলাম, যন্ত্রের উপর যদি খুব বেশি করে মানুষের কাজের ভার দেওয়া যায়, তা হলে ক্রমে একদিন যন্ত্র আর মানুষের দাস থাকবে না, মানুষই যন্ত্রের দাসত্ব করবে।'

ঠিক এই সময় উইঙ্গফিল্ড ও কেন্‌সলি এসে পড়াতে প্রসঙ্গটা চাপা পড়ে গেল। যন্ত্র সম্বন্ধে কুট্‌নার ধারণাটা নতুন নয়। ভবিষ্যতে মানুষ যে যন্ত্রের দাসে পরিণত হতে পারে তার লক্ষণ অনেকদিন থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। খুব সহজ একটা উদাহরণ দিই। মানুষ যে ভাবে যানবাহনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে সেটা আগে ছিল না। শহরের মানুষও আগে অক্লেশে পাঁচ-সাত মাইল হাঁটত প্রতিদিন ; এখন তাদের ট্রাম বাস রিকশা না হলে চলে না। কিন্তু তাই বলে কি আর বিজ্ঞান তার কাজ করে যাবে না ? মানুষের কাজ সহজ করার জন্য যন্ত্র তৈরি হবে না ? মানুষ আবার সেই আদিম যুগে ফিরে যাবে ?

১৪ই মার্চ, কিয়োটো

কিয়োটো সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক যা কিছু শুনেছি এবং পড়েছি, তার একটাও মিথ্যে বা বাড়ানো নয়। একটা জাতের সৌন্দর্যজ্ঞান আর রুচিবোধ যে একটা শহরের সর্বত্র এরকমভাবে ছড়িয়ে থাকতে পারে সেটা না দেখলে বিশ্বাস হত না। আজ দুপুরে কিয়োটোর এক বিখ্যাত বৌদ্ধমন্দির আর তার সংলগ্ন বাগান দেখতে গিয়েছিলাম। এমন শান্ত পরিবেশ এর আগে কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। মন্দিরে জাপানের বিখ্যাত মনীষী তানাকার সঙ্গে আলাপ হল। ঋষিতুল্য মানুষ। পরিবেশের সঙ্গে আশ্চর্য খাপ খায় এঁর সৌম্য স্বভাব। আমাদের দিগ্‌গজ যন্ত্রটির কথা শুনে স্মিতহাস্য করে বললেন, 'চাঁদটা সূর্যের সামনে এলে দুইয়ে মিলে এক হয়ে যায় কার খেয়ালে সেটা বলতে পারে তোমাদের যন্ত্র ?'

দার্শনিকের মতোই প্রশ্ন বটে। সূর্যের তুলনায় চাঁদ এত ছোট, অথচ এই দুইয়ের দূরত্ব পৃথিবী থেকে এমনই হিসেবের যে, চাঁদটা সূর্যের উপর এলে আমাদের চোখে ঠিক তার পুরোটাই ঢেকে ফেলে—এক চুল বেশিও না, কমও না। এই আশ্চর্য ব্যাপারটা যেদিন আমি বুঝতে পারি আমার ছেলেবেলায়, সেদিন থেকেই সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে আমার মনে একটা গভীর বিস্ময়ের ভাব রয়ে গেছে। আমরাই জানি না এই প্রশ্নের উত্তর, তো কম্পু জানবে কী করে ?

আরও একটা দিন কিয়োটোয় থেকে আমরা কামাকুরা যাব। কেন্‌সলি সঙ্গে থাকাতে খুব ভাল হয়েছে। ভাল জিনিস আরও বেশি ভাল লাগে একজন সমঝদার পাশে থাকলে।

১৫ই মার্চ

কিয়োটো স্টেশনে ট্রেনের কামরায় বসে ডায়রি লিখছি। কাল রাত দেড়টার সময় প্রচণ্ড ভূমিকম্প। জাপানে এ জিনিসটা প্রায়ই ঘটে, কিন্তু এবারের কাঁপুনিটা রীতিমতো বেশি, আর স্থায়িত্ব প্রায় ন' সেকেন্ড। শুধু এটাই যে ফিরে যাবার কারণ তা নয়। ভূমিকম্পের দরুন একটা ঘটনা ঘটেছে যেটার কিনারা করতে হলে ওসাকায় ফিরতেই হবে। আজ ভোর পাঁচটায় মাৎসুয়ে ফোনে খবরটা দিল।

কম্পু উধাও।

টেলিফোনে বিস্তারিতভাবে কিছু বলা সম্ভব হয়নি। মাৎসুয়ে এমনিতেও ভাঙা ভাঙা

priyoboi.blogspot.com

ইংরিজি বলে, তার উপরে উত্তেজনায় তার কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল। এটা জানলাম যে, ভূমিকম্পের পরেই দেখা যায় যে, কম্পু আর তার জায়গায় নেই, আর পেলুসিডাইটের স্ট্যান্ডটা মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। প্রহরী দুজনকেই নাকি অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া যায়, আর দু'জনেরই পা ভাঙা, ফলে দু'জনেই এখন হাসপাতালে। তাদের এখনও জ্ঞান হয়নি, কাজেই তাদের এ অবস্থা কেন হল সেটা জানা যায়নি।

কিয়োটোতে বাড়ি ভেঙে পড়ে নব্বইজন মেয়ে পুরুষ আহত হয়েছে। স্টেশনে লোকের মুখে আর কোনও কথা নেই। সত্যি বলতে কী কাল যখন ঝাঁকুনিটা শুরু হয় তখন আমারও রীতিমতো অস্থির ও অসহায় মনে হচ্ছিল। কেন্‌সলি সমেত আমি হোটেলের বাইরে বেরিয়ে এসেছিলাম, এবং বাইরে ভিড় দেখে বুঝেছিলাম যে কেউই আর ভিতরে নেই। জাপানে নাকি গড়ে প্রতিদিন চারবার ভূমিকম্প হয়, যদিও তার বেশির ভাগই এত মৃদু কম্পন যে, সিজমোগ্রাফ যন্ত্র আর কিছু পশুপক্ষী ছাড়া কেউই সেটা টের পায় না।

এ কী অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে পড়া গেল ! এত অর্থ, এত শ্রম, এত বুদ্ধি খরচ করে পৃথিবীর সেরা কম্পিউটার তৈরি হল, আর হবার তিন দিনের মধ্যে সেটা উধাও ?

১৫ই মার্চ, ওসাকা, রাত এগারোটা

আমাদের বাসস্থান ইন্টারন্যাশনাল গেস্ট হাউসে আমার ঘরে বসে ডায়রি লিখছি। নামুরা ইনস্টিটিউটের দক্ষিণে একটা পার্কের উলটোদিকে এই গেস্ট হাউস। আমার জানলা থেকে ইনস্টিটিউটের টাওয়ার দেখা যেত, আজ আর যাচ্ছে না, কারণ সেটা কালকের ভূমিকম্পে পড়ে গেছে।

আজ মাৎসুয়ে স্টেশনে এসেছিল তার গাড়ি নিয়ে। সেই গাড়িতে আমরা সোজা চলে গেলাম ইনস্টিটিউটে। ইতিমধ্যে দুজন প্রহরীর একজনের জ্ঞান হয়েছে। সে যা বলছে তা হল এই—ভূমিকম্পের সময় সে আর তার সঙ্গী দুজনেই পাহারা দিচ্ছিল। কম্পন খুব জোরে হওয়াতে তারা একবার ভেবেছিল ছুটে বাইরে চলে যাবে, কিন্তু কম্পুর ঘর থেকে একটা শব্দ শুনে তারা অনুসন্ধান করতে চাবি খুলে ঘরে ঢোকে।

এর পরের ঘটনাটা প্রহরী যেভাবে বলছে সেটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। ঘর খুলেই নাকি দুজনে দেখে যে, কম্পুর স্ট্যান্ডটা মাটিতে পড়ে আছে, আর কম্পু নিজে ঘরের এ মাথা থেকে ও মাথা গড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ভূমিকম্পের জের ততক্ষণে কিছুটা কমেছে। প্রহরী দুজনেই কম্পুর দিকে এগিয়ে যায় তাকে ধরতে। সেই সময় কম্পু নাকি গড়িয়ে এসে তাদের সজোরে আঘাত করে, ফলে দুজনেরই পা ভেঙে যায় এবং দুজনেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

এই আপনা থেকে গড়িয়ে পালিয়ে যাবার বিবরণটা যদি মিথ্যে হয় তা হলে অন্য সম্ভাবনাটা হচ্ছে চুরি। প্রহরী দুজনই যে নেশা করেছিল সেটা মিনিমোতো—অর্থাৎ যার জ্ঞান হয়েছে—স্বীকার করেছে। এই অবস্থায় যদি ভূমিকম্প শুরু হয় তা হলে তারা জান বাঁচাতে বাইরে পালাবে সেটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। ইনস্টিটিউটের ল্যাবরেটরিতে নাকি কাজ হচ্ছিল সেই রাত্রে, এবং গবেষকরা প্রত্যেকেই নাকি ঝাঁকুনির তেজ দেখে বাইরে মাঠে বেরিয়ে আসে। অর্থাৎ ইনস্টিটিউটের দরজাগুলো সেই সময় বন্ধ ছিল না। কাজেই বাইরে থেকে ভিতরে লোক ঢুকতেও কোনও অসুবিধা ছিল না। দক্ষ চোর এই ভূমিকম্পের সুযোগে একটি বেয়াল্লিশ কিলো ওজনের গোলক বগলদাবা করে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে ইনস্টিটিউট থেকে বেরিয়ে যেতে পারে অনায়াসে।

মোটকথা, চুরি হোক আর না হোক, কম্পু আর তার জায়গায় নেই। কে নিয়েছে,

কোথায় রয়েছে, তাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে কি না, এর কোনওটারই উত্তর এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। জাপানসরকার এরমধ্যে রেডিও ও টেলিভিশন মারফত জানিয়ে দিয়েছে যে, যে ব্যক্তি যন্ত্রটা উদ্ধার করতে পারবে তাকে পাঁচ লক্ষ ইয়েন—অর্থাৎ প্রায় দশ হাজার টাকা—পুরস্কার দেওয়া হবে। পুলিশ তদন্ত শুরু করে দিয়েছে, যদিও ইতিমধ্যে দ্বিতীয় প্রহরীরও জ্ঞান হয়েছে, এবং সে-ও অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেছে যে, যন্ত্রটা চুরি হয়নি, সেটা নিজেই কোনও আশ্চর্য শক্তির জোরে চালিত হয়ে দুই প্রহরীকেই জখম করে কামরা থেকে বেরিয়ে গেছে।

প্রহরীদের কাহিনী আমাদের মধ্যে একমাত্র কুট্‌নাই বিশ্বাস করেছে, যদিও তার সপক্ষে কোনও যুক্তি দেখাতে পারেনি। কেন্‌সলি ও উইঙ্গফিল্ড সরাসরি বলেছে চুরি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। প্ল্যাটিনাম অতি মূল্যবান ধাতু। দামের দিক দিয়ে সোনার পরেই প্ল্যাটিনাম। আজকাল জাপানি ছেলেছোকরাদের মধ্যে অনেকেই নেশার ঝোঁকে বেপরোয়া কাজ করে থাকে। বিশেষ করে সরকারকে অপদস্থ করতে পারলে তারা আর কিছু চায় না। এমন কোনও দল যদি কম্পুকে চুরি করে থাকে তা হলে মোটা টাকা আদায় না করে তাকে ফেরত দেবে না। তাই যদি হয় তা হলে এটা হবে যন্ত্র কিডন্যাপিংয়ের প্রথম নজির।

অনুসন্ধানের কাজটা খুব সহজ হবে বলে মনে হয় না, কারণ ভূমিকম্পের জের এখনও চলেছে। ওসাকায় দেড়শোর ওপর লোক মারা গেছে, আর অল্পবিস্তর জখম হয়েছে প্রায় হাজার লোক। দু-একদিনের মধ্যেই যে আবার কম্পন হবে না তার কোনও স্থিরতা নেই।

এখন রাত এগারোটা। কুট্‌না এই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত আমার ঘরে ছিল। কম্পুর স্বেচ্ছায় পালানোর কাহিনী সে বিশ্বাস করলেও কেন পালিয়েছে সেটা অনেক ভেবেও বার করতে পারেনি। তার ধারণা, ভূমিকম্পে মাটিতে আছড়ে পড়ে তার যন্ত্রের কোনও গোলমাল হয়ে গেছে। অর্থাৎ তার মতে কম্পুর মাথাটা বিগড়ে গেছে।

আমি নিজে একদম বোকা বনে গেছি। এরকম অভিজ্ঞতা এর আগে কখনও হয়নি।

১৬ই মার্চ, রাত সাড়ে এগারোটা

আজকের শ্বাসরোধকারী ঘটনাগুলো এইবেলা লিখে রাখি। আমরা চার বৈজ্ঞানিকের মধ্যে একমাত্র কুট্‌নাই এখন মাথা উঁচু করে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে, কারণ তার অনুমান যে অনেকাংশে সত্যি সেটা আজ প্রমাণ হয়ে গেছে। এই ঘটনার পরে ভবিষ্যতে আর কেউ যান্ত্রিক মস্তিষ্ক তৈরি করার ব্যাপারে সাহস পাবে বলে মনে হয় না।

কাল রাত্রে ডায়রি লিখে বিছানায় শুয়ে বেশ কিছুক্ষণ ঘুমোতে পারিনি। শেষটায় আমার তৈরি ঘুমের বড়ি সম্‌নোলিন খাব বলে বিছানা ছেড়ে উঠতেই উত্তরের জানলাটার দিকে চোখ পড়ল। এই দিকেই সেই পার্ক—যার পিছনে নামুরা ইনস্টিটিউট। এই পার্ক হচ্ছে সেই ধরনের জাপানি পার্ক যাতে মানুষের কারিগরির ছাপ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। গাছপালা ফুলফল ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে পায়ে হাঁটা পথ, এখানে ওখানে বিক্ষিপ্ত ছোট বড় পাথরের টুকরো, হঠাৎ এক জায়গায় একটা জলাশয়—যাতে কুলকুলিয়ে জল এসে পড়ছে নালা থেকে—সব মিলিয়ে পরিবেশটা স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক, অথচ সবই হিসেব করে বসানো, সবটাই মানুষের পরিকল্পনা। এক বর্গমাইল জুড়ে এইরকম একটা বন বা বাগান বা পার্ক রয়েছে অতিথিশালা আর ইনস্টিটিউটের মাঝখানে।

বিছানা ছেড়ে উঠে আমার চোখ গেল এই পার্কের দিকে, কারণ তার মধ্যে একটা টর্চের আলো ঘোরাফেরা করছে। আমার ঘর থেকে দূরত্ব অনেক, কিন্তু জাপানি টর্চের আলোর

তেজ খুব বেশি বলে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে জ্বলছে মাঝে মাঝে নিভছে, এবং বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে ঘোরাফেরা করছে আলোটা।

প্রায় মিনিটপনেরো ধরে এই আলোর খেলা চলল, তারপর টর্চের মালিক যেন বেশ হতাশ হয়েই পার্ক ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেলেন।

সকালে নীচে ডাইনিংরুমে গিয়ে বাকি তিনজনকে বললাম ঘটনাটা এবং স্থির করলাম যে, ব্রেকফাস্ট সেরে পার্কে গিয়ে একবার অনুসন্ধান করব।

আটটা নাগাত আমরা চারজন বেরিয়ে পড়লাম। ওসাকা জাপানের অধিকাংশ শহরের মতোই সমতল। সারা শহরে ছড়িয়ে আছে সরু সরু নালা আর খাল, আর সেগুলো পেরোবার জন্য সুদৃশ্য সব সাঁকো। রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা খাড়াই উঠে তারপর পার্কের গাছপালা শুরু হয়। তারই মধ্যে একটা হাঁটাপথ দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। মেপল, বার্চ, ওক, চেস্টনাট ইত্যাদি বিলিতি গাছে পার্কটা ভর্তি। অবিশ্যি জাপানের বিখ্যাত চেরিগাছও রয়েছে। জাপানিরা অনেককাল আগে থেকেই তাদের দেশের নিজস্ব গাছ তুলে ফেলে তার জায়গায় বিলিতি গাছের চারা পুঁততে শুরু করেছে, তাই এরকম একটা পার্কে এলে জাপানে আছি সে কথাটা মাঝে মাঝে ভুলে যেতে হয়।

মিনিটপনেরো চলার পরে প্রথম একজন অন্য মানুষকে দেখতে পেলাম পার্কের মধ্যে। একটি জাপানি ছেলে, বছর দশ-বারো বয়স, মাথার চুল কদমছাঁটে ছাঁটা, কাঁধে স্ট্র্যাপ থেকে ঝুলছে ইস্কুলের ব্যাগ। ছেলেটি আমাদের দেখে থমকে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আমাদেরই দিকে। কুট্‌না জাপানি জানে, সে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কী?'

'সেইজি,' বলল ছেলেটা।

'এখানে কেন এসেছ?'

'ইস্কুল যাচ্ছি।'

কুট্‌না ছাড়বার পাত্র নয়। বলল, 'তা হলে রাস্তা ছেড়ে ঝোপের দিকে যাচ্ছিলে কেন?'

ছেলেটি চুপ।

ইতিমধ্যে কেন্‌সলি ডানদিকে একটু এগিয়ে গিয়েছিল, সে কী জানি দেখে ডাক দিল, 'কাম হিয়ার, শঙ্কু।'

কেন্‌সলি তার পায়ের কাছে ঘাসের দিকে চেয়ে আছে। আমি আর উইঙ্গফিল্ড এগিয়ে দেখি, জমির খানিকটা অংশের ঘাস এবং সেইসঙ্গে একটা বুনো ফুলের গাছ চাপ লেগে মাটির সঙ্গে সিঁটিয়ে গেছে। দু'পা এগোতেই চোখে পড়ল একটা চ্যাপটানো প্রাণী—এক বিঘত লম্বা একটি গিরগিটি। গাড়ির চাকা বা অন্য কোনও ভারী জিনিস ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেলে এরকমভাবে পিষে যাওয়া স্বাভাবিক।

এবার কেন্‌সলি কুট্‌নার দিকে ফিরে বলল, 'আস্ক হিম ইফ হি ওয়াজ লুকিং ফর এ বল।'

ছেলেটি এবার আর জবাব এড়াতে পারল না। সে বলল, গতকাল ইস্কুল থেকে ফেরার পথে সে একটা ধাতুর বল দেখেছিল এই পার্কে একটা ঝোপের পিছনে। কাছে যেতেই বলটা গড়িয়ে দূরে চলে যায়। অনেক ছোটাছুটি করেও সে বলটার নাগাল পায়নি। বিকেলে বাড়ি ফিরে টেলিভিশনে জানতে পারে যে, ঠিক ওইরকম একটা বলের সন্ধান দিতে পারলে পাঁচ লক্ষ ইয়েন পুরস্কার পাওয়া যাবে। তাই সে গতকাল রাত্রেও টর্চ নিয়ে বলটা খুঁজেছে, কিন্তু পায়নি।

আমরা ছেলেটিকে বোঝালাম যে, এই পার্কেই যদি বলটা পাওয়া যায় তা হলে আমরা তাকে পুরস্কার পাইয়ে দেব, সে নিশ্চিন্তে ইস্কুল যেতে পারে। ছেলেটি আশ্বস্ত হয়ে তার ঠিকানা জানিয়ে দিয়ে দৌড় দিল ইস্কুলের দিকে, আর আমরা চারজনে চারদিকে ছড়িয়ে গিয়ে

আবার খোঁজা শুরু করলাম। যে যন্ত্রটা পাবে, সে অন্যদের হাঁক দিয়ে জানিয়ে দেবে।

পায়েহাঁটা পথ ছেড়ে গাছপালা ঝোপঝাড়ের দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। কম্পু যদি সত্যিই সচল হয়ে থাকে তা হলে তাকে পেলেও সে ধরা দেবে কি না জানি না। তার উপরে তার যদি মানুষের উপর আক্রোশ থেকে থাকে তা হলে যে সে কী করতে পারে তা আমার অনুমানের বাইরে।

চতুর্দিকে দৃষ্টি রেখে মিনিটপাঁচেক চলার পর এক জায়গায় দেখলাম দুটো প্রজাপতি মাটিতে পড়ে আছে; তারমধ্যে একটা মৃত, অন্যটার ডানায় এখনও মৃদু স্পন্দন লক্ষ করা যাচ্ছে। গত কয়েক মিনিটের মধ্যে কোনও একটা ভারী জিনিস তাদের উপর দিয়ে চলে গেছে সেটা বোঝাই যাচ্ছে।

আমি এক পা এক পা করে অতি সন্তর্পণে এগোতে শুরু করেছি, এমন সময় একটা তীক্ষ্ণ শব্দ শুনে আমাকে থমকে যেতে হল।

শব্দটা শিসের মতো এবং সেটাকে লিখে বোঝাতে গেলে তার বানান হবে ক-য়ে দীর্ঘ উ।

আমি শব্দের উৎস সন্ধানে এদিক ওদিক চাইতে আবার শোনা গেল—

'কূ— !'

এবারে আন্দাজ পেয়ে শব্দ লক্ষ্য করে বাঁ দিকে এগিয়ে গেলাম। এ যে কম্পুর গলা তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আর ওই 'কূ' শব্দের একটাই মানে হতে পারে: সে আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে।

বেশি দূর যাবার দরকার হল না। একটা জেরেনিয়াম গাছের পিছনে সূর্যের আলো এসে পড়েছে কম্পুর দেহে। সে এখন অনড়। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওই কূ শব্দই বোধহয় অন্য তিনজনকেও জানিয়ে দিয়েছে কম্পুর অস্তিত্ব। তিনজনেই তিনদিক থেকে ব্যস্তভাবে এগিয়ে এল আমার দিকে। এই গাছপালার পরিবেশে মসৃণ ধাতব গোলকটিকে

priyoboi.blogspot.com

ভারী অস্বাভাবিক লাগছিল দেখতে। কম্পুর চেহারায় সামান্য পরিবর্তন হয়েছে কি ? সেটা তার গা থেকে ধুলো মাটি আর ঘাসের টুকরো ঝেড়ে না ফেলা পর্যন্ত বোঝা যাবে না।

'ওয়ান থ্রি ওয়ান থ্রি ওয়ান থ্রি সেভন।'

কেন্‌সলি মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে কম্পুকে সক্রিয় করার মন্ত্রটা আওড়াল। কম্পু বিকল হয়েছে কি না জানার জন্য আমরা সকলেই উদগ্রীব।

'সম্রাট নেপোলিয়ন কোন কোন যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন ?'

প্রশ্নটা করল উইঙ্গফিল্ড। ঠিক এই প্রশ্নটাই সেদিন ডিমনস্ট্রেশনে এক সাংবাদিক করেছিল কম্পুকে, আর মুহূর্তের মধ্যে নির্ভুল জবাব দিয়েছিল আমাদের যন্ত্র।

কিন্তু আজ কোনও উত্তর নেই। আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি, বুকের ভিতরে একটা গভীর অসোয়াস্তির ভাব দানা বাঁধছে। উইঙ্গফিল্ড গোলকের আরও কাছে মুখ এনে আবার প্রশ্নটা করল।

'কম্পু, সম্রাট নেপোলিয়ন কোন কোন যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন ?'

এবারে উত্তর এল। উত্তর নয়, পালটা প্রশ্ন—'তুমি জান না ?'

উইঙ্গফিল্ড হতভম্ব। কুট্‌নার মুখ হাঁ হয়ে গেছে। তার চাহনিতে বিস্ময়ের সঙ্গে যে আতঙ্কের ভাবটা রয়েছে সেটা কোনও অলৌকিক ঘটনার সামনে পড়লেই মানুষের হয়।

যে কারণেই হোক, কম্পু আর সে কম্পু নেই। মানুষের দেওয়া ক্ষমতাকে সে কোনও অজ্ঞাত উপায়ে অতিক্রম করে গেছে। আমার ধারণা, তার সঙ্গে এখন কথোপকথন সম্ভব। আমি প্রশ্ন করলাম—

'তোমাকে কেউ নিয়ে এসেছে, না তুমি নিজে এসেছ ?'

'নিজে।'

এবারে কুট্‌না প্রশ্ন করল। তার হাত পা কাঁপছে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

'কেন এলে ?'

উত্তর এল তৎক্ষণাৎ—

'টু প্লে।'

'খেলতে ?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

উইঙ্গফিল্ড আর কেন্‌সলি মাটিতে বসে পড়েছে।

'এ চাইল্ড মাস্ট প্লে।'

এসব কী বলছে আমাদের যন্ত্র ? আমরা চারজনে প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলাম—'শিশু ? তুমি শিশু ?'

'তোমরা শিশু, তাই আমি শিশু।'

অন্যেরা এই উত্তরে কী ভাবল জানি না, কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম কম্পু কী বলতে চাইছে। বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও স্বীকার করতেই হবে যে, মানুষ যত না জানে, তার চেয়ে জানে না অনেক বেশি। এই যে গ্র্যাভিটি বা অভিকর্ষ, যেটার প্রভাব সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে আছে, যেটার উপস্থিতি আমরা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করছি, সেটাও আজ পর্যন্ত মানুষের কাছে রহস্যই রয়ে গেছে। সেই হিসেবে আমরাও শিশু বই কী !

এখন কথা হচ্ছে কম্পুকে নিয়ে কী করা যায়। যখন দেখা যাচ্ছে তার মন বলে একটা পদার্থ আছে, তখন তাকেই জিজ্ঞেস করা উচিত। বললাম, 'তোমার খেলা শেষ ?'

'শেষ। বয়স বাড়ছে।'

'এখন কী করবে ?'

'ভাবব।'

pathagar.net

'এখানেই থাকবে, না আমাদের সঙ্গে যাবে ?'

'যাব।'

গেস্টহাউসে পৌঁছেই মাৎসুয়েকে ডেকে পাঠালাম। তাকে বোঝালাম যে, এই অবস্থায় আর কম্পুকে ইনস্টিটিউটে রাখা যায় না, কারণ সর্বক্ষণ তার দিকে নজর রাখা দরকার। অথচ কম্পুর এই অবস্থাটা প্রচার করাও চলে না।

শেষ পর্যন্ত মাৎসুয়েই স্থির করল পন্থা। কম্পুকে তৈরি করার আগে পরীক্ষা করার জন্য ওরই সাইজে দুটো অ্যালুমিনিয়ামের গোলক তৈরি করা হয়েছিল, তারই একটা ইনস্টিটিউটে রেখে দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হবে যে যন্ত্রটা উদ্ধার হয়েছে, আর আসল যন্ত্র থাকবে আমাদের কাছে এই গেস্টহাউসেই। এখানে বলে রাখি যে আমরা চার বৈজ্ঞানিক ছাড়া এখন আর কেউ এখানে নেই। দোতলা বাড়িতে ঘর আছে সবসুদ্ধ ষোলোটা। আমরা চারজনে দোতলার চারটে ঘরে রয়েছি, টেলিফোনে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগের বন্দোবস্ত রয়েছে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মাৎসুয়ে একটি কাচের বাক্স পাঠিয়ে দিল আমার ঘরে। তারই মধ্যে তুলোর বিছানায় কম্পুকে রাখা হয়েছে। অতি সাবধানে তার গা থেকে ধুলো মুছিয়ে দেবার সময় লক্ষ করলাম যে, তার দেহটা আর আগের মতো মসৃণ নেই। প্ল্যাটিনাম অত্যন্ত কঠিন ধাতু, কাজেই যন্ত্র যতই গড়াগড়ি করুক না কেন, এত সহজে তার মসৃণতা চলে যাওয়া উচিত না। শেষমেষ কম্পুকেই কারণ জিজ্ঞেস করলাম। কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে সে উত্তর দিল—

'জানি না। ভাবছি।'

বিকেলের দিকে মাৎসুয়ে আবার এল, সঙ্গে একটি টেপ রেকর্ডার। এই রেকর্ডারের বিশেষত্ব এই যে, মাইক্রোফোনে শব্দতরঙ্গ প্রবেশ করামাত্র আপনা থেকে রেকর্ডার চালু হয়ে যায়, আর শব্দ থামলেই বন্ধ হয়। রেকর্ডার কম্পুর সামনে রাখা রইল, ওটা আপনা থেকেই কাজ করবে।

মাৎসুয়ে বেচারি বড় অসহায় বোধ করছে। ইলেকট্রনিকসের কোনও বিদ্যাই তাকে এই পরিস্থিতিতে সাহায্য করছে না। তার ইচ্ছা ছিল গোলকটাকে খুলে ফেলে তার ভিতরের সার্কিটগুলো একবার পরীক্ষা করে দেখে, কিন্তু আমি তাকে নিরস্ত করলাম। বললাম, ভিতরে গণ্ডগোল যাই হয়ে থাক না কেন, তার ফলে এখন যেটা হচ্ছে সেটাকে হতে দেওয়া উচিত। কম্পিউটার তৈরি করার ক্ষমতা মানুষের আছে, এবং ভবিষ্যতেও থাকবে, কিন্তু কম্পু এখন যে চেহারা নিয়েছে সেরকম যন্ত্র মানুষ কোনওদিনও তৈরি করতে পারবে কি না সন্দেহ। তাই এখন আমাদের কাজ হবে শুধু কম্পুকে পর্যবেক্ষণ করা, এবং সুযোগ বুঝে তার সঙ্গে কথোপকথন চালানো।

সন্ধেবেলা আমার ঘরে বসে চারজনে কফি খাচ্ছি, এমন সময় কাচের বাক্সটা থেকে একটা শব্দ পেলাম। অতি পরিচিত রিনরিনে কণ্ঠস্বর। আমি উঠে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিছু বললে ?'

উত্তর এল—'জানি। বয়সের ছাপ।'

অর্থাৎ সকালে তাকে যে প্রশ্ন করেছিলাম সেটার উত্তর এতক্ষণে ভেবে বার করেছে কম্পু। প্ল্যাটিনামের রুক্ষতা হল বয়সের ছাপ।

'তুমি কি বৃদ্ধ ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'না,' বলল কম্পু, 'আই অ্যাম নাউ ইন মাই ইউথ।'

অর্থাৎ এখন আমার জোয়ান বয়স।

আমাদের মধ্যে এক উইঙ্গফিল্ডের হাবভাবে কেমন যেন খটকা লাগছে আমার। মাৎসুয়ে

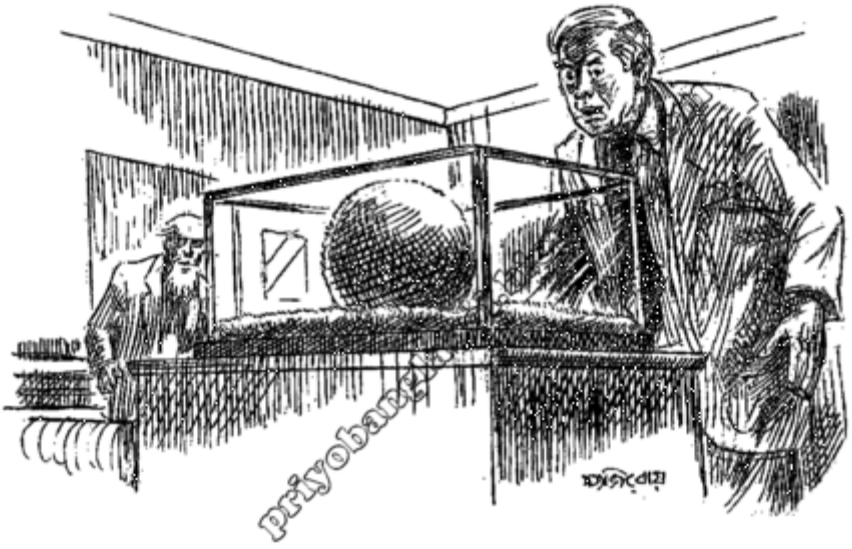

যখন যন্ত্রটাকে খুলে পরীক্ষা করার প্রস্তাব করেছিল, তখন একমাত্র উইঙ্গফিল্ডই তাতে সায় দিয়েছিল। তার আপশোস যে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে কম্পিউটারটাকে তৈরি করা হয়েছিল সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে গেল। কম্পু নিজে থেকে কথা বলতে আরম্ভ করলেই উইঙ্গফিল্ড কেন জানি উশখুশ করতে থাকে। কম্পুর এ হেন আচরণের মধ্যে যে একটা ভৌতিক ব্যাপার রয়েছে সেটা অস্বীকার করা যায় না ; কিন্তু তাই বলে একজন বৈজ্ঞানিকের এরকম প্রতিক্রিয়া হবে কেন ? আজ তো এই নিয়ে একটা কেলেঙ্কারিই হয়ে গেল। কম্পু আমার সঙ্গে কথা বলার মিনিটখানেকের মধ্যেই উইঙ্গফিল্ড চেয়ার ছেড়ে গটগট করে কম্পুর দিকে এগিয়ে গিয়ে আবার সেই একই প্রশ্ন করে বসল—'সম্রাট নেপোলিয়ন কোন কোন যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন ?' ভাবটা যেন যন্ত্রের কাছ থেকে যান্ত্রিক উত্তরটা পেলেই সে আশ্বস্ত হবে।

কিন্তু উত্তর যেটা এল সেটা একেবারে চাবুক। কম্পু বলল, 'যা জানো তা জানতে চাওয়াটা মূর্খের কাজ।'

এই উত্তরে উইঙ্গফিল্ডের যা অবস্থা হল সে আর বলবার নয়। আর সেইসঙ্গে তার মুখ থেকে যে কথাটা বেরোল তেমন কথা যে একজন প্রবীণ বৈজ্ঞানিকের পক্ষে উচ্চারণ করা সম্ভব এটা আমি ভাবতে পারিনি। অথচ দোষটা উইঙ্গফিল্ডেরই ; সে যে কম্পুর নতুন অবস্থাটা কিছুতেই মানতে পারছে না সেটা তার ছেলেমানুষি ও একগুঁয়েমিরই লক্ষণ।

আশ্চর্য এই যে, কম্পুও যেন উইঙ্গফিল্ডের এই অভদ্রতা বরদাস্ত করতে পারল না। পরিষ্কার কণ্ঠে তাকে বলতে শুনলাম, 'উইঙ্গফিল্ড, সাবধান !'

এর পরে আর উইঙ্গফিল্ডের এঘরে থাকা সম্ভব নয়। সে সশব্দে দরজা বন্ধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কেন্‌সলি আর কুট্‌না এর পরেও অনেকক্ষণ ছিল। কেন্‌সলির ধারণা উইঙ্গফিল্ডের মাথার ব্যামো আছে, তার জাপানে আসা উচিত হয়নি। সত্যি বলতে কী, আমাদের মধ্যে কাজ সবচেয়ে কম করেছে উইঙ্গফিল্ড। মেরিভেল জীবিত থাকলে এটা হত না, কারণ ইলেকট্রনিকসে সেও ছিল একজন দিকপাল।

আমরা তিনজনে আমারই ঘরে ডিনার সারলাম। কারুরই মুখে কথা নেই, কম্পুও

নির্বাক। তিনজনেই লক্ষ করছিলাম যে, কম্পুর দেহের রুক্ষতা যেন ঘণ্টায় ঘণ্টায় বেড়ে চলেছে।

দুই বিজ্ঞানী চলে যাবার পর আমি দরজা বন্ধ করে বিছানায় এসে বসেছি, এমন সময় কম্পুর কণ্ঠস্বরে টেপ রেকর্ডারটা আবার চলতে শুরু করল। আমি কাচের বাক্সটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। কম্পুর গলার স্বর আর তেমন তীক্ষ্ণ নেই ; তাতে একটা নতুন গাম্ভীর্য লক্ষ করা যাচ্ছে।

'তুমি ঘুমোবে ?' প্রশ্ন করল কম্পু।

আমি বললাম, 'কেন জিজ্ঞেস করছ ?'

'স্বপ্ন দেখ তুমি ?'—আবার প্রশ্ন।

'তা দেখি মাঝে মাঝে। সব মানুষই দেখে।'

'কেন ঘুম ? কেন স্বপ্ন ?'

দুরূহ প্রশ্ন করেছে কম্পু। বললাম, 'সেটা এখনও সঠিক জানা যায়নি। ঘুমের ব্যাপারে একটা মত আছে। আদিম মানুষ সারাদিন খাদ্যের সন্ধানে পরিশ্রম করে রাত্রে কিছু দেখতে না পেয়ে চুপচাপ তার গুহায় বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়ত, তারপর দিনের আলো চোখে লাগলে তার ঘুম ভেঙে যেত। মানুষের সেই আদিম অভ্যেসটা হয়তো আজও রয়ে গেছে।'

'আর স্বপ্ন ?'

'জানি না। কেউই জানে না।'

'আমি জানি।'

'জান ?'

'আরও জানি। সৃষ্টির রহস্য জানি। মানুষ কবে এল জানি। মাধ্যাকর্ষণ জানি। সৃষ্টির গোড়ার কথা জানি।'

আমি হতভম্ব হয়ে চেয়ে আছি কম্পুর দিকে। টেপ রেকর্ডার চলছে। বিজ্ঞানের কাছে যা রহস্য, তার সন্ধান কি কম্পু দিতে চলেছে ?

না, তা নয়।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে কম্পু বলল, 'মানুষ অনেক জেনেছে। এগুলোও জানবে। সময় লাগবে। সহজ রাস্তা নেই।'

তারপর আবার কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর—'কেবল একটা জিনিস মানুষ জানবে না। আমার জানতে হবে। আমি মানুষ নই। আমি যন্ত্র।'

'কী জিনিস ?'—আমি উদগ্রীব হয়ে প্ল্যাটিনাম গোলকটার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলাম।

কিন্তু কম্পু নির্বাক। টেপ রেকর্ডার থেমে আছে। মিনিটতিনেক এইভাবে থাকার পর সেটা আবার বলে উঠল—শুধু দুটো শব্দ রেকর্ড করার জন্য—

'গুড নাইট।'

১৮ই মার্চ

আমি হাসপাতালে বসে ডায়রি লিখছি। এখন অনেকটা সুস্থ। আজই বিকেলে ছাড়া পাব। এই বয়সে এমন একটা বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতা হতে পারে সেটা ভাবতে পারিনি। কম্পুর কথা না শুনে যে কী ভুল করেছি, সেটা এখন বুঝতে পারছি।

পরশু রাত্রে কম্পু গুড নাইট করার পর বিছানায় শুয়ে কয়েকমিনিটের মধ্যেই আমার ঘুম

এসে গিয়েছিল। এমনিতে আমার খুব গাঢ় ঘুম হয়, তবে কোনও শব্দ হলে ঘুমটা ভাঙেও চট করে। কাজেই টেলিফোনটা যখন বেজে উঠল, তখন মুহূর্তের মধ্যেই আমি সম্পূর্ণ সজাগ। পাশে টেবিলে লুমিনাস ডায়ালওয়ালা ট্র্যাভলিং ক্লকে দেখলাম আড়াইটে।

টেলিফোনটা তুলে হ্যালো বলতে শুনলাম উইঙ্গফিল্ডের গলা।

'শঙ্কু, তোমার ঘুমের বড়ি একটা পাওয়া যাবে? আমার স্টক শেষ।'

স্বভাবতই এতে আমার আপত্তির কোনও কারণ থাকতে পারে না। আমি বললাম এক মিনিটের মধ্যে তার ঘরে গিয়ে আমি বড়ি দিয়ে আসব। উইঙ্গফিল্ড বলল সে নিজেই আসছে।

আমি বড়ি বার করতে সঙ্গে সঙ্গেই দরজার সুরেলা ঘণ্টাটা বেজে উঠল। উঠে গিয়ে খুলতে যাব এমন সময় কম্পুর গলা পেলাম—

'খুলো না।'

আমি অবাক। বললাম, 'কেন?'

'উইঙ্গফিল্ড অসৎ।'

এসব কী বলছে কম্পু!

এদিকে দরজার ঘণ্টা আবার বেজে উঠেছে, আর তার সঙ্গে উইঙ্গফিল্ডের ব্যস্ত কণ্ঠস্বর—'তুমি ঘুমিয়ে পড়লে নাকি, শঙ্কু? আমি স্লিপিং পিলের জন্য এসেছি।'

কম্পু তার নিষেধাজ্ঞা জানিয়ে চুপ করে গেছে।

আমি দেখলাম দরজা না খোলায় অনেক মুশকিল। কী কৈফিয়ত দেব তাকে? যদি এই যন্ত্রের কথা সত্যি না হয়?

দরজা খুললাম, এবং খোলার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় একটা প্রচণ্ড আঘাতে আমি সংজ্ঞা হারালাম।

যখন জ্ঞান হল তখন আমি হাসপাতালে। আমার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে তিন বৈজ্ঞানিক—কুট্‌না, কেন্‌সলি আর মাৎসুয়ে। তারাই দিল আমাকে বাকি ঘটনার বিবরণ।

আমাকে অজ্ঞান করে উইঙ্গফিল্ড কম্পুকে দুভাগে ভাগ করে বগলদাবা করে নিজের ঘরে চলে যায়। তারপর সুটকেসের মধ্যে কম্পুর দু অংশ পুরে ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করে নীচে গিয়ে ম্যানেজারকে জানায় যে তাকে প্লেন ধরতে এয়ারপোর্টে যেতে হবে, তার জন্য যেন গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়। এদিকে গেস্টহাউসের এক ভৃত্য উইঙ্গফিল্ডের তিনটে সুটকেস নীচে নিয়ে আসার সময় তার একটা অস্বাভাবিক ভারী মনে হওয়ায় তার সন্দেহের উদ্রেক হয়, সে পাহারার জন্য মোতায়েন পুলিশের লোককে গিয়ে সেটা জানায়। পুলিশের লোক উইঙ্গফিল্ডকে চ্যালেঞ্জ করলে উইঙ্গফিল্ড মরিয়া হয়ে রিভলভার বার করে। কিন্তু পুলিশের তৎপরতার ফলে উইঙ্গফিল্ডকে হার মানতে হয়। সে এখন হাজতে আছে—সন্দেহ হচ্ছে ম্যাসাচুসেটসে তার সহকর্মী মেরিভেলের মৃত্যুর জন্য সে দায়ী হতে পারে। কম্পু তার আশ্চর্য ক্ষমতার বলে তার স্বরূপ প্রকাশ করে দিতে পারে এই ভয়ে সে কম্পুকে নিয়ে সরে পড়ার চেষ্টা করেছিল, হয়তো এয়ারপোর্টে যাবার পথে কোথাও তাকে ফেলে দিত।

আমি সব শুনে বললাম, 'কম্পু এখন কোথায়?'

মাৎসুয়ে একটু হেসে বলল, 'তাকে আবার ইনস্টিটিউটে ফিরিয়ে নিয়ে গেছি। গেস্টহাউসে রাখাটা নিরাপদ নয় সে তো বুঝতেই পারছ। সে তার কামরাতেই আছে। তাকে আবার জোড়া লাগিয়েছি।'

'সে কথা বলছে কি?'

'শুধু বলছে না, আশ্চর্য কথা বলছে। জাপানে ভূমিকম্প থেকে রক্ষা পাবার জন্য

একরকম বাড়ির পরিকল্পনা দিয়েছে, যেগুলো জমি থেকে পাঁচ মিটার উপরে শূন্যে ভাসমান অবস্থায় থাকবে। বিজ্ঞান আজকাল যেভাবে এগিয়ে চলেছে, তাতে এটা দশ বছরের মধ্যেই জাপান সরকার কার্যকরী করতে পারবে।'

'আর কিছু বলেছে?'

'তোমাকে দেখতে চায়,' বলল মাৎসুয়ে।

আমি আর থাকতে পারলাম না। মাথার যন্ত্রণা চুলোয় যাক, আমাকে ইনস্টিটিউটে যেতেই হবে।

'পারবে তো?' একসঙ্গে প্রশ্ন করল কুট্‌না ও কেন্‌সলি।

'নিশ্চয়ই পারব।'

আধঘণ্টার মধ্যে আবার সেই সুদৃশ্য কামরায় গিয়ে হাজির হলাম। আবার সেই স্ফটিকের স্তম্ভের উপর বসে আছে কম্পু। সিলিং থেকে তীব্র আলোকরশ্মি গিয়ে পড়েছে তার উপর, আর সেই আলোয় বেশ বুঝতে পারছি কম্পুর দেহের মসৃণতা চলে গিয়ে এখন তার সর্বাঙ্গে ফাটল ধরেছে। এই চারদিনে তার বয়স অনেক বেড়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

আমি কম্পুর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। কোনও প্রশ্ন করার আগেই তার শান্ত, গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

'ঠিক সময়ে এসেছ। আর সাড়ে তিন মিনিটে ভূমিকম্প হবে। মৃদু কম্পন। টের পাবে, তাতে কারুর ক্ষতি হবে না। আর তখনই আমার শেষ প্রশ্নের উত্তর আমি পাব। সে উত্তর কোনও মানুষে পাবে না কোনওদিন।'

এরপর আর কী বলা যায়। আমরা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে রইলাম। কম্পুর কয়েক হাত উপরেই ইলেকট্রিক ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটা এগিয়ে চলেছে টকটক করে।

এক মিনিট...দু মিনিট...তিন মিনিট...। অবাক চোখে দেখছি কম্পুর দেহের ফাটল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের জ্যোতিও বাড়ছে। শুধু বাড়ছে কি? তা তো নয়—তার সঙ্গে রঙের পরিবর্তন হচ্ছে যে!—এ তো প্ল্যাটিনামের রং নয়, এ যে সোনার রং!

পনেরো সেকেন্ড...বিশ সেকেন্ড...পঁচিশ সেকেন্ড...

ঠিক ত্রিশ সেকেন্ডের মাথায় পায়ের তলার মেঝেটা কেঁপে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে এক অপার্থিব বর্ণচ্ছটা বিকীর্ণ করে কম্পুর দেহ সশব্দে খণ্ড খণ্ড হয়ে স্ফটিকস্তম্ভের উপর থেকে শ্বেতপাথরের মেঝেতে পড়ল, তার ভিতরের কলকবজা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ধুলোর মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, আর সেই ভগ্নস্তূপ থেকে একটা রুদ্ধ হিম করা অশরীরী কণ্ঠস্বর বলে উঠল—

'মৃত্যুর পরের অবস্থা আমি জানি!'

আনন্দমেলা। পূজাবার্ষিকী ১৩৮৫

priyobanglaboi.blogspot.com